পরশুরাম প্রসঙ্গে

কালিদাস দত্ত

রাস্তার নামটি রোমান্টিক। কবিতার একটি স্নিগ্ধ চরণের মত। বকুলবাগান রোড। হয়ত একদিন বকুলফুলের গাছ ছিল, বাগান ছিল, আজ নেই। থাকলেও এক-আধটি, তেমন চোখে পড়ে না। এই রোমান্টিক নাম-যুক্ত সরণির লোহার গেট-অলা একটি বড় বাড়িতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বরিষ্ঠ হাস্যরস-স্রষ্টা পরশুরাম প্রায় নিঃসঙ্গ, নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। বাড়ির সামনে একটুকরো বাগান। বাড়িতে ঢুকলে প্রথমেই যে অনুভূতিতে মন ছেয়ে যায়, সেটি নির্জনতা এবং নিঃসঙ্গতার। কেন যেন মনে হয়, একটা বিষণ্ণতার ছায়া বাড়িটির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

পরশুরাম কিন্তু উন্নত এবং বয়স অনুপাতে সুস্বাস্থ্য। ১৮ই মার্চ তিনি ৮১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করবেন। এখনও অতিথিদের অভ্যর্থনায় নিজে এগিয়ে আসেন, নিষেধ থাকা সত্ত্বেও অনেক কথা উজাড় করে বলতে চান, বাংলায় কথা বলার সময় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন না, করলেও সংশোধন করে দেন, কদাচিৎ হাসেন; কিন্তু তরুণতম লেখকদের সম্পর্কে খোঁজ রাখেন, কৌতূহল প্রকাশ করেন। আমাদের ঘণ্টা দুইয়ের সাক্ষাৎকারের মধ্যে ভিতর থেকে দু'বার বিরতির অনুরোধ আসা সত্ত্বেও তিনি আমাকে মৃদু হাস্যে অভয় দিয়ে শেষ প্রশ্নটি পর্যন্ত উত্তর দিয়ে যান। ক্ষোভ, অনুযোগ কিংবা বিতর্কমূলক প্রসঙ্গে বারংবার আমার "নোট" নেওয়ায় বাধা দিয়ে বলেছেন, "এসব কথা টুকবেন না। এসব

সম্পাদকের নিবেদন: সম্ভবত রাজশেখর বসু জীবনে এই একটি সাক্ষাৎকারই দিয়েছিলেন। অন্তর্মুখী মানুষটি নিজের সম্বন্ধে বলতে খুব একটা ভালোবাসতেন না। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল যুগান্তরে। কিন্তু কোন সাল বা কোন তারিখ তা বলতে পারছিলেন না অভিজ্ঞজনরা। প্রায় গোয়েন্দা-কাহিনির মত একটির পর একটি সূত্র জুড়তে জুড়তে আমরা আবিষ্কার করে ফেলি যে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ই মার্চ, ১৯৬০; ১৮ই মার্চ— রাজশেখরের জন্মদিনের দু'দিন আগে। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে যেদিন আমরা সাক্ষাৎকারটির প্রতিলিপি উদ্ধার করি সেদিন মনে হয়েছিল হয়তো রাজশেখর চর্চায় আমাদের এই প্রচেষ্টা সামান্য হলেও কিছু অবদান রাখবে। রাজশেখরকে নিয়ে প্রচলিত বিতর্কের প্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকারটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কথা শুধু আপনার এবং আমার মধ্যে। এখন এই বয়সে, আমি আমার বন্ধুদের কাউকেই ক্ষুণ্ণ করতে চাই না।"

শ্রবণেন্দ্রিয়ে ভিন্ন বয়সের নির্মম স্নেহ স্পর্শ পরশুরামের শরীরে তেমন পড়েনি। কাঁচা-পাকা চুল, ঈষৎ ম্লান চক্ষু, প্রতিটি কথা অনুধাবনে স্থির, অবিচল প্রয়াস, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব— এই মিলিয়ে "শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড", "কচি সংসদ", "ভষণ্ডীর মাঠে"র স্রষ্টা পরশুরাম। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু কেমন দেখতে ইচ্ছা করে, যদিও তাঁর মতে, উভয়ে এক এবং অভিন্ন, হাফ মিস্ত্রী, হাফ-কেরাণী, "লেখক", কিন্তু "সাহিত্যিক" নন।

আমি যে প্রশ্নগুলি তাঁকে করেছিলুম এবং সেগুলির তিনি যে সুস্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন তা নীচে প্রশ্নোত্তর আকারে দেওয়া হল।

প্রশ্ন: নমস্কার নেবেন। ভরসা করি, শারীরিক অসুবিধা বোধ করছেন না?

উত্তর : মন্দের ভালো আছি বলা চলে। মাস তিনেক আগে মৃগীর আক্রমণ হয়ে যায়। এখনও মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করি।

প্রশ্ন: আপনার অনুরাগী পাঠক হিসেবে আমরা আপনার শতায়ু কামনা করি। আপনি কি এখনও নিয়ম করে দৈনিক কিছু কিছু লেখেন?

উত্তর: কিচ্ছু না। শেষ লেখা পাঁচ-ছ' মাস আগের তৈরী।

প্রশ্ন: যতদূর জানি "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" ১৯২২ সালে আপনার বয়স যখন বিয়াল্লিশ তখনকার লেখা। এটি আপনার সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা। এর আগে আর কিছু লেখেননি?

উত্তর: ছাপবার জন্য কিছু লিখিনি, বিজ্ঞাপন আর ক্যাটালগ ছাড়া।

প্রশ্ন: সমস্ত কিছু রচনার মূলেই একটি সাহিত্যিক-প্রেরণা থাকে। এই লেখাটির মূলে কোন প্রেরণা কাজ করেছিল জানাবেন কি?

উত্তর: হয়ত কিছু ছিল না। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পর, অনেক কোম্পানী রাতারাতি গড়ে ওঠে এবং ফেল পড়ে (ডুবে যায়)। অসাধু ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্গচিত্র রচনাই উদ্দেশ্য ছিল।

প্রশ্ন: এই লেখাটি এবং আপনার অন্যান্য গল্প পড়ে ঈর্ষা-দ্বেষ-জ্বালাহীন একটি সকৌতুক আনন্দলাভ করা যায়। উইট, হিউমার এবং স্যাটায়ারের পার্থক্য স্মরণে রেখে আপনার লেখাগুলিকে উইট মিশ্রিত হিউমারের পর্যায়ে ফেলা যায়। তবু আপনি "পরশুরাম" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন কেন? পরশুরাম নামটির সঙ্গে ক্ষমাহীন বীর্যের উগ্র ভাবানুষঙ্গ কি জড়িত নেই?

উত্তর: হিউমারের মধ্যে সহানুভূতির মিশ্রণ আছে, উইটের মধ্যে নেই— এধরণের পার্থক্য বুঝি না। স্যাটায়ারের তফাৎটা বুঝি। তার মধ্যে কাষাঘাত এবং জ্বালা আছে। হিউমার ভাষাগত নয়, কাজেই ভাষান্তরিত করা সম্ভব। উইট ভাষাগত, স্থানগত, কালগত,

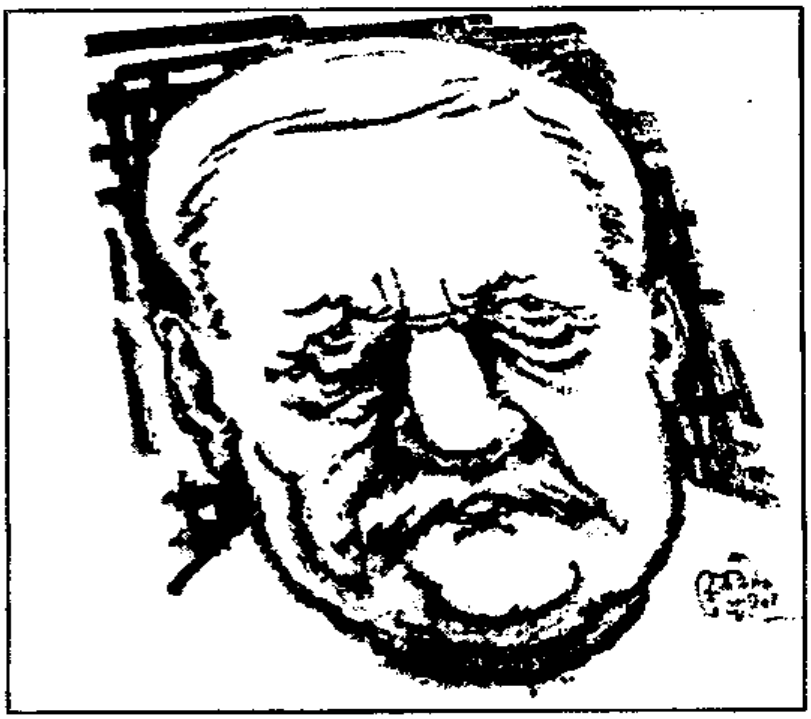

রেবতীভূষণ-কৃত রাজশেখরের বৃদ্ধ বয়সের পোর্ট্রেট। যুগান্তর, ১৬ই মার্চ, ১৯৬০

জাতিগত, কাজেই ওর অনুবাদ হয় না। হিউমার সার্বজনীন, উইট তা নয়। আমার লেখায় উইট বেশি থাকায় অনুবাদ করা শক্ত। হিউমারের মধ্যে সহানুভূতি বা করুণা থাকবেই এমন মনে করি না। গ্রিম হিউমার নামেও একটি হিউমার আছে। হ্যামলেটের অনেক উক্তিই এই পর্যায়ে পড়ে।

পরশুরাম ছদ্মনাম গ্রহণের মধ্যে পৌরাণিক কোন কটাক্ষ বা শ্লেষ নেই। অনেকবারই সে কাহিনী আমি বলেছি। "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" ভারতবর্ষের জন্য লেখা, কিন্তু স্বনামে ছাপতে আমার আপত্তি ছিল। সম্পাদক জলধর সেন মশাই ছদ্মনাম গ্রহণের কথা বলেন। দৈবক্রমে তখন বাড়িতে এক স্যাকরা তারাচাঁদ পরশুরামের আবির্ভাব ঘটে। চটপট পরশুরাম নামটি লাগিয়ে দিই। আর কোনদিন কিছু লিখব তখন জানতুম না।

প্রশ্ন: মুকুন্দরামের "ভাড়ুদত্তের" ও পূর্ব থেকে বাংলা সহিত্যে যে হাস্যরসের স্রোত বয়ে এসেছে, তা কি আপনার যথেষ্ট বলে মনে হয়?

উত্তর: দেশে যদি দারিদ্র্য কম হত, তবে হাস্যরস বেশি সৃষ্টি হত। ইংরেজি সাহিত্যের দশ ভাগের এক ভাগ হাস্যরসও বাংলা সাহিত্যে নেই।

প্রশ্ন: অনেকে বলেন, হাস্যরস-স্রষ্টার মধ্যে কিছু সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স এবং সহানুভূতিশীল হৃদয়ের মিশ্রণ থাকে। জীবনের অসঙ্গতিগুলি তাঁর চোখে প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। সভ্যতার অগ্রগতির অর্থ, যদি ধরা হয় জীবনের অসাম্য এবং অসঙ্গতিকে অপসারিত করা, তাহলে নিখুঁত সমাজে হাস্যরসের অস্তিত্ব থাকবে কি? যদি থাকে, তবে চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে?

উত্তর: আপনার প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। আমি সাইকোলজিস্ট নই। হাস্যরসিক অনেক কিছুই দেখেন। কোন সময় তিনি ন্যায্যভাবে ঠাট্টা করেন, কোন সময় অন্যায্যভাবে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে হাস্যরসের কোনই বিরোধ নেই। হাস্যরস সভ্যতারই অঙ্গ। সব সময়ই তা থাকবে। বরং সভ্যতার অগ্রগতি যত হবে, হাস্যরসের সৃষ্টিও ততই

বাড়বে। তখন একজন যেটা মনে করবে ঠিক, আর একজন ভাববে বেঠিক। অত্যন্ত সত্যবাদী এবং নিয়মনিষ্ঠ মানুষও ঠাট্টার পাত্র হয়ে থাকেন।

প্রশ্ন: আপনার যৌবনে অমৃতলাল বসু "পঞ্চানন্দ" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় হাস্যরস স্রষ্টা হিসেবে প্রচুর আনন্দ বিরতণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কার লেখা আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগত?

উত্তর: ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা।

প্রশ্ন: "কঙ্কাবতী","মুক্তমালা" বা "ডমরুচরিতে"র অমর রসস্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় হাস্যরসের গন্ধমাদন এনে হাজির করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, আপনি তার মধ্যে দু-একটি বিশল্যকরণীর সন্ধান পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে পারি কি? (প্রশ্নটিতে যদি কিছু ঔদ্ধত্য থাকে ক্ষমা করবেন)।

উত্তর: লেখক যা দেখেন, যা পড়েন, যা শোনেন, তার প্রভাব তাঁর উপর পড়েই, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে— যাইহোক।

প্রশ্ন: কোন কোন পত্র-পত্রিকায় আপনার গল্পের সঙ্গে বিদেশী গল্পের মিল দেখিয়ে কিছু তীক্ষ্ণ সমালোচনা ইত্যাদি হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উত্তর: আমার মনে হয়, এর কোন উত্তর আমার কাছে না চাওয়াই ভালো। তবে 'দেশ' পত্রিকায় আমার "রাজমহিষী" বলে একটি গল্প বেরোয়। এক ভদ্রলোক পত্র দিয়ে জানান যে, ওডহাউসের কোন গল্পের সঙ্গে গল্পটির মিল আছে। গল্পটির নাম এই মুহূর্তে আমি স্মরণ করতে পারছি না। "রাজমহিষী' লেখার পূর্বে ওডহাউসের সেই বইটি আমি পড়িনি; একটি ইংরাজী পত্রিকায় অবশ্য ঐ ধরণের একটি গল্প পড়েছিলুম— তার গল্পে আমার গল্পের একটি বিষয়েই শুধু মিল আছে। সেটি আমি ওর থেকেই নিয়েছি। আমার উচিত ছিল ঋনস্বীকার করা। ভুলক্রমে সেটি হয়নি। "আনন্দীবাঈ" গ্রন্থ তখন ছাপা হচ্ছিল। সেখানে ঋণস্বীকার করেছি। এই ধরনের অন্যান্য গল্পেরও আমি ঋণস্বাকীর করেছি।

প্রশ্ন: আপনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটির সদস্য। পরিভাষা সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

উত্তর: বলতে গেলে অনেক বলতে হয়। তবে নতুন অবস্থায় শব্দগুলি কানে লাগে ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশ চলে দেখি। যেমন আমারই তৈরী রেডিও-অ্যাকটিভের বাংলা প্রতিশব্দ "তেজস্ক্রিয়" প্রথম শুনতে খটমট লাগত। আজকাল তো সব কাগজেই দেখি নির্বিবাদে শব্দটির ব্যবহার চলছে। আসলে উপায় কি? ক্লাসিক ভাষা থেকে শব্দ আহরণ এবং শব্দগঠন করতেই হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের সাংবাদিকদের দায়িত্ব অনেকখানি। কারণ, আজকাল জনসাধারণ গ্রন্থ থেকে যতখানি ভাষা শিক্ষা করেন, সংবাদপত্র থেকে তার চাইতে বেশি শেখেন এবং দ্রুত শেখেন। ভুল পরিভাষার প্রচারে সাংবাদিকরাই বেশি দায়ী। অনেক ভুল প্রায়ই চোখে পড়ে। "আয়রণ ওর"— এর পরিভাষা "আকরিক লৌহ"

নয়, হবে "লৌহ আকরিক", তেমনি "পেট্রোলিয়অম ফাউন্ড" অর্থে লেখা হয় "পেট্রল" পাওয়া গেছে। কিন্তু মাটির নীচে কোনওকালেই পেট্রল পাওয়া যায় না, পেট্রোলিয়আমই শুধু মেলে। শুনেছি ইংরাজী "টাইমস" পত্রিকায় সাংবাদিকদের ভুল সংশোধনের জন্য ভাষাবিদ নিযুক্ত হত। তাঁরা প্রায়ই নির্দেশ দিতেন, "ওই শব্দটি নয়, এই শব্দটি ব্যবহার কর।" বাংলা পত্রিকায়ও এমনটি হওয়া দরকার।

একটা মজার অনুবাদ শুনুন। "দি পোলিস ওয়্যার পেট্রলিং দি রোডস"— এর অনুবাদ একবার করা হয় "পুলিশ রাস্তায় পেট্রল ছিটাইতেছিল"। বুঝুন ব্যাপার।

প্রশ্ন: দয়া করে বলবেন কি কোন পত্রিকায় আপনি এমন অনুবাদ দেখেছেন?

উত্তর: তা বলতে পারব না। এটি আমার শোনা কাহিনী।

প্রশ্ন: আপনার "বিচিন্তা" গ্রন্থের কোন এক রচনার সূত্রানুযায়ী আপনাকে "রাসায়নিক সাহিত্যিক" বলা যায় না। অথচ আমরা জানি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালে আপনি দীর্ঘকাল গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনও সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। একই সঙ্গে শ্রমিক এবং লেখনী চালনায় কখনও কোন মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন কি?

উত্তর : না। বোধ করি, কেউই হন না। একই লোক ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে পারেন।

প্রশ্ন: দীর্ঘকাল আপনি শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁদের আপনি নিশ্চয়ই ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেছেন। কাজেই তাঁদের নিয়ে আপনি কিছু লিখবেন এমন প্রত্যাশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। এই প্রসঙ্গে চেখফের "ডেথ্ অব এ ক্লার্ক" গল্পটির কথা আমার মনে পড়ছে। সেই জাতীয় লেখা কেমন মনে হয়?

উত্তর: শ্রমিকদের মধ্যে আমি খুব মিশেছি। তাঁদের খুবই প্রিয় ছিলাম আমি। অনেকটা এক পরিবারভুক্ত পরিজনের মত। এখন সে অবকাশ নেই, সামর্থ্যও নেই। মিশেছি বেশি কারিগরদের সঙ্গে, স্বভাবটাও আমার হয়েছে সেইরকম খানিকটা। কেরানীদের চাইতে তাঁদের বড়ো মনে করি। তাঁদের নিয়ে লেখা "ভূষণ পাল" নামে আমার একটি গল্প "চমৎকুমারী" গ্রন্থ আছে। ঘটনা কিছুটা সত্য। আর একটি লিখেছিলুম, ছাপিনি। আমি অবশ্যই তাঁদের সংসারের খবর কিছু জানি না। আধুনিককালে যাঁরা জানার সেই সুযোগ পাচ্ছেন, তাঁরা তো চমৎকার লিখছেন।

প্রশ্ন: "সাহিত্যিকের ব্রত" শীর্ষক এক প্রবন্ধে আপনি বলেছেন, "লেখক নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী বা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী হতে পারেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগবলের প্রভাব মানতে পারেন বা সোভিএট তন্ত্রের একান্ত অনুরাগী হতে পারেন— লেখকের রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উল্লেখ থাকতে পারে, কিন্তু রস-বিচারের সময় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।" একই প্রবন্ধে অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের প্রয়োজন— হ্যারিয়েট বীচার স্টো এবং দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় শক্তিশালী বহু লেখক— যাঁরা সামাজিক

পাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে পারবেন।" এই প্রবন্ধে আপনার সংস্কার মুক্ত মনের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তা যে কোন লেখকরেই গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু একটি কথা। সাহিত্যের রস-বিচারের মাপকাঠি কী, এবং 'জনসাধারণকে' উত্তেজিত করার সঙ্গে রসের সম্পর্ক কী, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন?

উত্তর: রসবিচারের সময় কোনই সম্পর্ক নেই। তবে, যা নিয়ে কোন মতভেদের অবকাশই নেই সেই সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকলেই লিখতে পারেন। লেখা দরকারও। শুধু প্রেম ইত্যাদি নিয়ে লিখলেই তো কাজ শেষ হয় না।

প্রশ্ন: আপনার গ্রন্থের জন্য আপনি কী কী পুরষ্কার পেয়েছেন?

উত্তর: রবীন্দ্র পুরষ্কার এবং সাহিত্য একাডেমীর পুরষ্কার। অবশ্য এঁদের পুরষ্কার বিতরণ বিষয়ে আমার সঙ্গে মতভেদ আছে। কিন্তু সেকথা থাক।

প্রশ্ন: আপনার উপর আমি কিছুটা অত্যাচারই করলাম। আমি যে নোটগুলি নিলাম তা পড়ে স্বাক্ষর দিতে কোন অসুবিধা হবে কি?

উত্তর: না, অসুবিধা কিসের। তবে, মনে হয় দরকার ছিল না।

আমি: রসস্রষ্টা পরশুরাম এবং সাহিত্যিক রাজশেখর বসু উভয়ের কাছেই সাহিত্য পাঠক হিসেবে আমরা ঋণী। উভয়কেই আমি প্রণাম জানাই।

উত্তর: ভুল করবেন না। আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্যিক হতে গেলে কিছু বিদেশি এবং অনেক কিছু দেশী সাহিত্য পড়তে হয়। আমি প্রায় কিছুই পড়িনি। কাজেই আমাকে লেখক বলতে পারেন, সাহিত্যিক কিছুতেই নয়। আমার লেখার প্রশংসা অনেকেই করেন, কিন্তু মনে হয়, আমার লেখা তাঁরা পড়েন খুবই কম। আমার বইয়ের কাটতি সামান্যই।

এখানেই কথার শেষ।